১০০।

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

সমাবর্তন অনুষ্ঠান

উচ্চ শিক্ষার প্রতি সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি

আহমদ সেলিম রেজা

গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষিত জনশক্তি মূল উপাত্ত। শিক্ষিত জনশক্তি ব্যতীত 'গণতন্ত্র' অচলায়তনের অন্ধকারে হারিয়ে যেতে বাধ্য। এ কারণেই নাগরিক সভ্যতার বিকাশে শিক্ষার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড।

একটি শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব অনেক। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সে দায়িত্ব সমানভাবে পালিত না হলে শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলা দুরূহ। অথচ বাংলাদেশের শিক্ষা কর্মসূচী বহুদা বিভক্ত। এখানে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অধীনে যে শিক্ষাক্রম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত চালু রয়েছে, তার সাথে উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যক্রম সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আবার উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও সর্বত্র অর্থাৎ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে একই শিক্ষা ক্যারিকুলাম বাধ্যতামূলক নয়। সর্বত্র একটি হযবরল অবস্থা। শিক্ষা প্রশাসনেও এখানে বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান। এখানে রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা কমিটি। রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, আধা-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় (অর্থাৎ বেতন-ভাতা সরকারের; নিয়ম-নীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের), যেমন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল বিশ্ববিদ্যালয় এগুলো আধা-সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

আর এসবের কারণ '৪৭-এর দেশবিভাগের পর থেকে '৭০ পর্যন্ত এবং '৭১-এ স্বাধীনতা লাভের পর থেকে সর্বশেষ '৯৪ সাল পর্যন্ত কোন সর্বজন স্বীকৃত রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। কারণ, কোন সরকারই শিক্ষা বিভাগ নিয়ে খুব বেশী দূর এগোয়নি। সব সরকারই চেয়েছে শিক্ষা বিভাগকে পাশ কেটে দেশ শাসনের কাজটি নির্বিঘ্ন করতে। কারণ, বাংলাদেশের রাজনীতি বহুলাংশে শিক্ষা বিভাগ তথা শিক্ষাঙ্গন-নির্ভর। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারও তার থেকে ব্যতিক্রম কিছু নন। গণশিক্ষা কর্মসূচী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের দায়িত্বকে পাশ কেটে যাওয়ারই একটি অজুহাত কি-না তা-বা কে বলবে ? তারপরও বলতে হয়, শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের গৃহীত কতিপয় সিদ্ধান্ত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হলেও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচীর পুনরুল্লেখ করা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী, তাঁর উপদেষ্টাগণ, শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবের ভূমিকার তারিফ করতে হয়। বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার প্রতি বর্তমান সরকারের মনযোগ অন্য যে কোন সরকারের চেয়ে অধিক বলেই প্রতীয়মান হয়েছে। এর প্রমাণ মেলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সফল সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজনের মধ্যেও।

সমাবর্তন অনুষ্ঠান হল উচ্চ শিক্ষার প্রতি সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। অথচ স্বাধীনতার পর এই প্রথমবারের মত কোন সরকারপ্রধান এই বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিলেন। অবশ্য এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নবনিযুক্ত ভিসিদের দায়িত্বশীলতারও একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই নামোল্লেখ করতে হয় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডঃ মোহাম্মদ শাজাহান-এর নাম। তাঁরই উদ্যোগে বাংলাদেশে প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় এবং তিনি পরপর দু'টি সফল সমাবর্তন (কনভোকেশন)-এর আয়োজন করার কৃতিত্ব দেখান। তাঁরই উদ্যোগে খুলনা বিআইটির কনভোকেশন অনুষ্ঠানের বিষয়টিও এখানে উল্লেখের দাবী রাখে। এতে বিআইটি'র মর্যাদা বৃদ্ধিসহ উচ্চ শিক্ষায় বিআইটি'র অবদানকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেয়া হল। তার পরই উল্লেখ করতে হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এমাজ উদ্দীন-এর নাম। তাঁরই সক্রিয় উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সফল সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। এরপর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়।

সর্বশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম চৌধুরীর দায়িত্বশীলতার প্রশংসা করতে হয়। কারণ, ইতিপূর্বে গণতান্ত্রিক শাসনামলে আরো দু'জন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে নিযুক্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা জাতিকে শুধু উপহার দিয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলার সংবাদ।

সর্বশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। এ জন্য নতুন ভিসি রফিকুল ইসলাম চৌধুরীর দায়িত্বশীলতার প্রশংসা করতে হয়। ইতিপূর্বে গণতান্ত্রিক শাসনামলে আরো দু'জন ভিসি অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা জাতিকে শুধু উপহার দিয়েছেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলার সংবাদ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন (কনভোকেশন) অনুষ্ঠিত হয় চলতি মাসের ৭ তারিখে। প্রতিষ্ঠার প্রায় সাতাশ বছর পর প্রথমবারের মতো এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজনের কৃতিত্ব (কতিপয় বিরোধিতাকারী ব্যতীত) আজ শুধু অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম চৌধুরীর একার কৃতিত্ব নয়। এই কৃতিত্ব চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীসহ সকলের। এই কৃতিত্ব চট্টগ্রামবাসীদের। এই সমাবর্তনের মাধ্যমে ৭২ হাজার ৮শ' ২৫ জনেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করা হয়েছে। দেশের উন্নয়নে এঁদের সকলের সম্মিলিত অবদান জাতিকে দিতে পারে নতুন দিকনির্দেশনা।

বলাবাহুল্য, সবগুলো সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর হিসেবে উপস্থিত থেকে সনদপত্র বিতরণ করেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকারপ্রধান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। এ প্রসঙ্গে গণতান্ত্রিক সরকারের ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর উপলব্ধি সম্পর্কে আমরা মূল্যায়ন করতে পারি। তিনি বলেছেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি যুগোপযোগী নয়। এটি এখনো ঔপনিবেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। উন্নয়নশীল একটি স্বাধীন জাতির উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে আমরা তাই মনযোগ দিয়েছি। প্রাথমিক শিক্ষা, নারী শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার উপর গুরুত্ব দিয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি, শিক্ষার প্রসার ঘটলে জাতির অনেক সমস্যার সমাধান হবে।'

এ প্রসঙ্গে আপাতত এটুকুই বলা চলে যে, সরকারপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রীর উপলব্ধি থেকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার যে অসম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া গেল, তা থেকে শিক্ষা ব্যবস্থার বহুদা-বিভক্তি ও সরকারের সুদূরপ্রসারী শিক্ষানীতি প্রণয়নের ব্যর্থতাকে আড়াল করা যায়নি। 'মনযোগ দিয়েছি', 'জোর দেয়া হয়েছে', 'গুরুত্ব দিয়েছি'। কোন কার্যকর সরকারী সংলাপ নয়। এসব রাজনৈতিক সংলাপ। বিষয়ের গুরুত্বকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশের সকল সরকারপ্রধান যুগ যুগ ধরে এই একই সুরে ও সংলাপে জনগণকে সন্তুষ্ট রাখতে চেয়েছে। কিন্তু এভাবে আর কত দিন ?